

ভালো থাকার জন্য জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা

মো. আবুল বাশার

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরাও নানারকম সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে চলেছে। প্রতিদিনই তাদের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ এসে হাজির হচ্ছে। কখনো কখনো তারা তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হচ্ছে আবার কখনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পরিবর্তে নিজেসাই বিভ্রান্ত হচ্ছে। এমনকি এসব চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কারও সহায়তা পাওয়ার বা বুদ্ধি জোগানোর জন্য কাউকে কাছে পাচ্ছে না। বর্তমান সমাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিদিনই নতুন ও অদ্ভিনব সমস্যা যোগ হচ্ছে। তাহলে এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কি কোন উপায় নেই?

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের নিজের ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদের ভিতরে কিছু দক্ষতাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া। আর এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর এবং সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী। এক্ষেত্রে আমাদের জন্য সুখের সংবাদ হচ্ছে ইতোমধ্যে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীতে কয়েকটি বিষয়ে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বহুসংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার জন্য জীবন দক্ষতা কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কাজেই আমাদের সবারই যদি জানা থাকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকতে সহায়তা করে, তবে কেবল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাই নয়, অন্য সকলেই জীবন দক্ষতার সুফল পাওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় বেশ কিছুসংখ্যক মাধ্যমিক শিক্ষকই জীবন দক্ষতা আয়ত্ত করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্য পুস্তকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, এইচআইভি এবং এইডস, মাদক ও বয়ঃসন্ধিকাল এই ৪টি ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাকে সাদামাটি চোখে দেখেন এবং কেবল বিষয়বস্তু হিসেবেই পড়ান।

ব্যাপারটি সেরকম ছিল না বা নয়। চিন্তাটি ছিল এসব বিষয়বস্তুর মাধ্যমে জীবন দক্ষতাসমূহ আয়ত্ত ও আত্মস্থ করানো বা করা। তাহলে আমাদের জানা উচিত জীবন দক্ষতা কী, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কী, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উপকারিতা কী? প্রথমই আসা যাক জীবন দক্ষতা কী- এ আলোচনায়। অনেকেই জীবন দক্ষতা (Life Skills) ও জীবিকা অর্জনের দক্ষতাকে (Livelihood Skills) গুলিয়ে ফেলেন বা এক মনে করেন। আসলে এ দুইটি ভিন্ন ধারণা। অর্থ আয় সংক্রান্ত ব্যক্তিগত দক্ষতা বা পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোকে জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বলা হয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা, ব্যবসা করার দক্ষতা, উদ্যোগ গ্রহণের দক্ষতা- এসবই সরাসরি জীবিকা অর্জনে সহায়তা করে।

তাই এগুলোকে জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বলা যায়। আবার সহজ কথায় মনোসামাজিক দক্ষতাসমূহই হচ্ছে জীবন দক্ষতা। এ গুলোকে মানব দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের দক্ষতাও বলা হয়। কখনো কখনো এগুলোকে ব্যক্তিগত দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, মানসিক দক্ষতা বা আবেগিক দক্ষতাও বলা হয়। যেভাবেই বলা হোক না কেন জীবন দক্ষতা হচ্ছে অপ্রাপ্যর ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন সম্পৃক্ত কাজ ও সমস্যা সূচকভাবে সম্পাদনের ও নিষ্পত্তির দক্ষতা। জীবন দক্ষতা হচ্ছে সেই সব দক্ষতা যা সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অপরিহার্য।

বুদ্ধি এবং আচরণগত দক্ষতার প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে, নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশের

সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। কাজেই বুদ্ধি এবং আচরণগত দক্ষতাগুলোকে জীবন দক্ষতা বলা হয়। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এরকম যে, কারও গাড়ি চালানোর দক্ষতা আছে এবং এ দক্ষতা ব্যবহার করে জীবিকা অর্জন করে। এটা জীবিকা অর্জনের দক্ষতা। আবার একজনকে যখন অন্যজন কুপণে পরিচালনার জন্য প্ররোচিত করে তখন এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সে যদি যথাযথভাবে 'না' বলতে পারে সেটা জীবন দক্ষতা। এর সঙ্গে অর্থ উপার্জনের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ১০টি জীবন দক্ষতা হচ্ছে- আত্মসচেতনতা, সহমর্মিতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা, বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ দক্ষতা, আবেগ সামালানোর দক্ষতা ও চাপ মোকাবিলার দক্ষতা। এই দক্ষতাসমূহের নামই বলে দিচ্ছে যে, এগুলোর কোনটিই জীবিকা অর্জন বা অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয়। এগুলো একজন ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক এই তিন ধরনের সুস্থতাই নির্দেশ করে। জীবন দক্ষতার ধারণার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়ার পরই মনে আসতে পারে যে, এগুলো কীভাবে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করা যায়? এর উত্তরের মাধ্যমেই, দ্বিতীয় প্রশ্ন- জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কী- এর উত্তর পাওয়া যায়। যে শিখন-শেখানো অভিজ্ঞতা বা ধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারে তাকেই জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বলা যায়। অর্থাৎ জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সুস্থ সৃজনশীল চিন্তনে, কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে, সুস্থ সম্পর্ক গড়তে, অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে এবং চাপ ও আবেগ মোকাবিলার সমর্থ করে তোলে। যার ফলে ছেলেমেয়েরা ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ ও বিচারাধীন সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে এবং সঠিক ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়। তৃতীয় জিজ্ঞাসা ছিল, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উপকারিতা কী? জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অনেক উপকার সাধিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সব সুবিধা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা বিপজ্জনক পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে ও এড়াতে পারবে, আত্ম উন্নয়ন ঘটাতে পারবে, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, অপরকে সাহায্য করবে, নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারবে, নিজ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারবে, অন্যের ক্ষতি না করে নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে, নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারবে, ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে, অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দূরদর্শিতার পরিচয় দিবে, নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সামাজিকীকরণে সক্ষম হবে, নিজে বাঁচবে অন্যকে বাঁচাবে, চিন্তার নতুন পথ খুঁজে পাবে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারবে, মুখে সুন্দর করে কথা বলার এবং সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করবে, অন্যকে দোষারোপ না করে নিজে দায়িত্ব নেয়ার মানসিকতা তৈরি হবে, অন্যের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করবে, সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার স্বাস্থ্যসম্মত উন্নয়নের মাধ্যমে কিশোর অবস্থা থেকে বয়স্ক অবস্থায় সফলতার সহিত পদার্পণ করবে, যে কোন পরিস্থিতি বা অবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ শনাক্ত করতে পারবে, শোনা ও মনোযোগ দিয়ে শোনার মধ্যে পার্থক্য করে যে অনুযায়ী যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটতে পারে।

শিক্ষা ব্যবস্থারও অনেকরকম উপকার হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। আচরণের কাকিত্ব পরিবর্তন হয়। বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতার উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষার্থীদের সমস্যাসমূহ কমে যায় অর্থাৎ অনেক সমস্যার

সমাধান তারা নিজেসাই করতে পারে। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উন্নয়নে সহায়তা করে। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকারও রয়েছে। নানা প্রকার রোগ নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় বিশেষ করে এসটিডি ও এইচআইভি/এইডস। ব্যক্তির সাধারণ ভালোর দিকে অবদান রাখতে পারে (শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক)।

নিজের এবং অন্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কে দায়িত্বসচেতন হতে সহায়তা করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সুফল পাওয়া যায়। অন্যের সঙ্গে বহুতৃপ্ত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষার্থীরা ভালো ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু খুঁজে নিতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের অবসর সময় সঠিকভাবে ব্যবহারে সহায়তা করে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয় কমিউনিটির মধ্যে অর্ধবহ সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে। চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। অর্ধবহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বজায় রাখতে সহায়তা করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে রূপান্তর সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করে। সমাজে মূল্যবোধের ব্যাখ্যা প্রদানে সহায়তা করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার আউটপুট হিসেবে কিছু আর্থনীতিক সুবিধা রয়েছে। মটিভেটেড ও শক্তিশালী শ্রম শক্তির কারণে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। নানা প্রকার রোগ বালাই থেকে মুক্তির কারণে শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হয়। বিনষ্ট সম্পদ মেরামত করা যায়। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধের মাধ্যমেও অর্থ সাশ্রয় হয়। আমাদের জন্য সুখের সংবাদ হচ্ছে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার এত রকম উপকার পাওয়ার জন্য যেসব পদক্ষেপ প্রয়োজন তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা, যা ইতোমধ্যে বর্তমান শিক্ষাবাদ্যব সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাক্রম জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনমূলক। কিন্তু কথা থেকে যায় যে, যারা পড়াবেন তারা যদি এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে কেবল সাদামাটিভাবে বিষয়বস্তু হিসেবে জ্ঞানভিত্তিক শিখন-শিখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহলে আসল উদ্দেশ্য অর্জন অনেক দূরে থেকে যাবে।

তাই প্রয়োজন জ্ঞানকে দক্ষতায় পরিণত করে প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এর জন্য প্রয়োজন জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ উপলব্ধি করা। বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষার্থীকে সুরক্ষামূলক আচরণ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে শেখায়। এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুশীলন জড়িত। আবার শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিক অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন ঘটায়। আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রদানে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি আবশ্যিক। কাজেই গতানুগতিক তথ্য মুখস্থ করানোর মাধ্যমে জীবন দক্ষতা অর্জন করানো সম্ভব নয়। শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণ জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার একটি পূর্বশর্ত। কেননা এ শিক্ষা কর্মসূচির মতোই প্রতিটি শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত থাকে। এ শিক্ষা জেগারপ্রবণ, অধিকারভিত্তিক ও বয়সোপযোগী। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে জীবন দক্ষতা অর্জন বা বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জনের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সর্বপ্রথম শিক্ষকের জ্ঞান উচিত পাঠ্যপুস্তকের কোন কোন পাঠ জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা সম্পৃক্ত। সে অনুযায়ী শিক্ষকগণ পাঠসমূহ পরিচালনায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন, পাঠসমূহ উপস্থাপন বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করার জন্য শিখন-শেখানোর বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবেন, যেমন- দলীয় কাজ, দলীয় আলোচনা, বিতর্ক, ভূমিকাভিনয়, গল্প বলা, কেইস স্টাডি, প্রশ্ন-উত্তর, প্রদর্শন, প্যানেল ডিসকাশন, এসআইনমেন্ট, সমস্যা সমাধান, অনুসন্ধানমূলক কাজ ইত্যাদি। যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা, পাঠের জন্য নির্ধারিত শিখনফল অর্জন

হচ্ছে কিনা এবং পাঠের মাধ্যমে জীবন দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে কিনা তা খেয়াল রাখা। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে প্রত্যেককে এককভাবে উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করা। বড় শ্রেণীতে অর্থাৎ অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী সম্বলিত শ্রেণীতে একাধিক পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন/ভূমিকাভিনয়/বিতর্ক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জনের সুযোগ পাবে। পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি এবং প্রেক্ষিতনির্ভর ডিডিও ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শিখনে আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। উল্লিখিত কাজগুলো করতে হলে সর্বোচ্চ প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জীবন দক্ষতাভিত্তিক পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ইউনিসেফের সহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর প্রশিক্ষণ শাখা, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহের শিক্ষকদের মাস্টার ট্রেনার তৈরির মাধ্যমে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ (এনসিটিবি) তাদের কর্মকর্তাদের মাস্টার ট্রেনার তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের ২০টি জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

এখন প্রয়োজন দেশের সব কয়টি জেলার মাধ্যমিক শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা। পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত জীবন দক্ষতা বিষয়ক পাঠসমূহের সমন্বয়ে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন ও তা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহের ব্যবস্থা করা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। প্রচার মাধ্যমে এ বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্লোগান, নাটিকা ও সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করা। বিএড শিক্ষাক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মনিটরিং কাজে জড়িত ব্যক্তিদের জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। পাঠ্যপুস্তক পুনর্মুদ্রণ ও নতুন সংস্করণের সময় জীবন দক্ষতা বিষয়ক শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার উপযোগী কিছু কাজ সংযোজন করা। কাজগুলো হতে পারে ভূমিকাভিনয়, বিতর্ক, পাঠসংশ্লিষ্ট ও প্রেক্ষিতনির্ভর কেইস স্টাডি ইত্যাদি। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে ই-লার্নিং ম্যাটেরিয়াল প্রণয়ন করা। সর্বোপরি কিশোর-কিশোরী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু যেমন- সহিংসতা ও শাস্তি বিষয়ক শিক্ষা, তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান না করা সংক্রান্ত, নৈতিক শিক্ষা, দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা ও সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রশিক্ষণ প্যাকেজ প্রণয়ন করা যেতে পারে। প্রচলিত চিন্তনক্ষেত্রভিত্তিক মূল্য যাচাইয়ের সঙ্গে দক্ষতাভিত্তিক মূল্য যাচাই কার্যক্রম গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারলে একদিকে গণগত শিক্ষা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভিতরে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো মনোবল ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে।

প্রেটো বলেছেন- 'চিকিৎসকেরা যে ভুল করেন তা হলো তারা মনের চিকিৎসা না করে শরীর সারতে চান। যদিও মন আর শরীর অবিচ্ছেদ্য তাই আল্লাহ যদিও চিকিৎসা করা উচিত নয়।' এ কথাকে অনুসরণ করে বলা যায় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক আচরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করার মাধ্যমে একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা।

[লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ডুগোল, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহ।]